بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ০৬ ফাতাহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হুদাইবিয়ার সন্ধির আলোচনায় আজ আরো কিছু বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করব। সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন,

সন্ধিচুক্তিতে কিছু ফাঁক-ফোকর থেকেই যায় যা পরবর্তীতে কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বয়ে আনে। হুদাইবিয়ার সন্ধিতেও এই ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এতে যদিও মুসলমান পুরুষদের ফেরত পাঠানো সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, কিন্তু এমন নারীদের কোনো উল্লেখ ছিল না যারা মক্কাবাসীদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হবেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন পরিস্থিতি সামনে আসতে থাকে যার ফলে মক্কার কাফিরদের কাছে এই ত্রুটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এই সন্ধিচুক্তির অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই মক্কা থেকে কয়েকজন মুসলমান নারী কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মদীনায় চলে আসেন। তাদের মাঝে প্রথম ছিল মক্কার এক প্রয়াত পৌত্তলিক নেতা **উকবা ইবনে আবি মুওয়াইতের কন্যা উম্মে কুলসুম**, যিনি মায়ের দিক থেকে (সম্পর্কে) হযরত ঊসমান বিন আফফান (রা.)-র বোন ছিলেন। উম্মে কুলসুম অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে পায়ে হেঁটে মদীনায় পৌঁছেন। সেই মহিলা এত দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। কিন্তু তার পেছনে পেছনে তার দুইজন নিকটাত্মীয় তাকে ধরার জন্য সেখানে পৌঁছে এবং তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি করে। তাদের দাবি ছিল, যদিও চুক্তিতে **পুরুষ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু চুক্তিটি মূলত সার্বজনীন আর নর-নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু চুক্তির শব্দাবলি যদি বিবেচনা না-ও করা হয়, তবুও কেবল নারী হবার কারণে উম্মে কুলসুম ব্যতিক্রমী আচরণের দাবিদার ছিলেন, কেননা নারীরা দুর্বল লিঙ্গ আর এমনিতেও পুরুষের বিপরীতে (তারা) পরাধীন হয়ে থাকে। তাই তাকে ফেরত পাঠানো মূলত তাকে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া এবং ইসলাম থেকে বঞ্চিত করার নামান্তর। কাজেই নারীকে এ চুক্তি বহির্ভূত গণ্য করা শুধুমাত্র চুক্তি অনুযায়ীই যথার্থ নয়, বরং বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকেও ন্যায়সঙ্গত এবং অপরিহার্য ছিল। এ কারণে প্রকৃতিগতভাবে এবং ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.) উম্মে কুলসুমের অনুকূলে রায় প্রদান করেন এবং তার আত্মীয়স্বজনদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। আর খোদা তা'লাও এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন। যেমন, সেই দিনগুলোতেই কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, **'যখন কোনো নারী ইসলাম গ্রহণের দাবি নিয়ে মদীনায় আসে তখন তার বিষয়ে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করো; আর যদি সে পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী প্রমাণিত হয় তাহলে কোনোক্রমেই তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না, কিন্তু সে যদি বিবাহিতা হয় তাহলে তার মোহরানা তার পৌত্তলিক স্বামীকে অবশ্যই পরিশোধ করো' (সূরা আল মুমতাহিনা: ১১)**। এরপর যখনই কোনো নারী মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় পৌঁছত

তখন প্রথমে ভালোভাবে তার পরীক্ষা নেওয়া হতো আর তার উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠা সুচারুরূপে যাচাই করা হতো। অতঃপর যেসব নারী পুণ্যবতী এবং নিষ্ঠাবতী প্রমাণিত হতো এবং তাদের হিজরতের পেছনে কোনো জাগতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ পাওয়া যেত না তাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়া হতো। বিবাহিতা হলে তাদের মোহরানা তাদের স্বামীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এরপর তারা মুসলমানদেরকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে স্বাধীন বিবেচ্য হতো।

সন্ধিচুক্তির শর্তাবলির প্রেক্ষাপটেই হযরত আবু বসীর সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিশদ বিবরণ হলো:

হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির শর্তাবলির মধ্যে একটি শর্ত এমন ছিল, যদি কুরাইশের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনায় আসে তাহলে মদীনাবাসীরা তাকে আশ্রয় দেবে না বরং ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু যদি কোনো মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় আসে তাহলে মক্কাবাসীরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। বাহ্যত এই শর্ত মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ছিল আর এ কারণে অনেক মুসলমানের হৃদয় ছিল দুঃখভারাক্রান্ত। এমনকি হযরত উমর (রা.)-র মতো অতি সম্মানিত এবং জ্ঞানী সাহাবীর মাঝেও সেই সময়কার উত্তেজনাকর পরিবেশে; [অর্থাৎ সেই পরিস্থিতিতে– যখন এই সিদ্ধান্তের কারণে মানুষের হৃদয়ে (তুষের) আগুন জ্বলছিল, উত্তেজনা বিরাজ করছিল যে, আমরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি–] এই শর্তের কারণে অসন্তোষ ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। কিন্তু এরপর অচিরেই এমন পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার ফলে একথা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এই শর্ত কুরাইশের জন্য দুর্বলতার কারণ এবং মুসলমানদের দৃঢ়তার কারণ ছিল। কেননা মহানবী (সা.) যেভাবে শুরুতেই বলে দিয়েছিলেন, যদি কোনো মুসলমান মদীনা থেকে ইসলাম (ধর্ম) ত্যাগ করে (মক্কায়) যায় তাহলে সে একটি পচা অঙ্গের মতো হবে। [মুনাফিক অথবা এমন মানুষ যাদের হৃদয়ে বক্রতা ছিল তারাই ইসলাম গ্রহণের পর পরিত্যাগ করতে পারতো, মুরতাদ হতো। তাই সে যেতে চাইলে নিঃসন্দেহে যেতে পারে; তাকে মদীনায় ফিরিয়ে আনার কী প্রয়োজন? তাই তিনি (সা.) প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন, ঠিক আছে, এই শর্তে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কেননা সে একটি পচা অঙ্গ, যা কর্তিত হওয়াই উত্তম।] কিন্তু এর বিপরীতে যদি কোনো ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে বের হয়, মদীনায় তার ঠাঁই হোক বা না হোক– সে যেখানেই থাকবে ইসলামের দৃঢ়তার কারণ হবে আর অবশেষে আল্লাহ্ তার জন্য কোনো না কোনো পথ উন্মুক্ত করে দেবেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অচিরেই স্বীয় সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা মহানবী (সা.)-এর (হুদাইবিয়া থেকে) মদীনায় ফেরত আসার পর খুব একটা বেশি সময় পার হয় নি, (এরই ভেতর) মক্কা নিবাসী বনু যুহরা গোত্রের মিত্র **আবু বসীর উতবা বিন উসাইদ সাকফী** নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কাবাসীদের বন্দিশালা থেকে পালিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। মক্কার কুরাইশরা তার পেছনে পেছন নিজেদের দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করে এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, আবু বসীরকে যেন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) আবু বসীরকে ডেকে পাঠান এবং ফিরে যাবার নির্দেশ প্রদান করেন। আবু বসীর উত্তরে হাহুতাশ আরম্ভ করে দেন; কান্নাকাটি আরম্ভ করে বলেন, আমি মুসলমান আর এই লোকেরা আমাকে মক্কায় কষ্ট দেবে এবং ইসলাম পরিত্যাগের জন্য বলপ্রয়োগ করবে। মহানবী (সা.) বলেন, চুক্তির কারণে আমরা অপারগ, তাই তোমাকে এখানে রাখতে পারব না। যদি তুমি খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে ধৈর্যধারণ করো তাহলে খোদা তোমার জন্য কোনো না কোনো পথ উন্মুক্ত করে দেবেন; কিন্তু আমরা নিরূপায় আর কোনো

অবস্থাতেই চুক্তিভঙ্গ করতে পারব না। [মহানবী (সা.) অঙ্গীকার পালনে কত–না যত্নবান ছিলেন!] অসহায় আবু বসীর তাদের সাথে ফিরতি যাত্রা করেন। কিন্তু যেহেতু তার হৃদয়ে এ বিষয়ে চরম ভীতি বা ত্রাস ছিল যে, মক্কায় পৌঁছার পর তার ওপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হবে আর তাকে ইসলামের মতো (অমূল্য) এই নিয়ামতকে গোপন রাখতে হবে, বরং নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার কারণে হয়ত মুসলমানই থাকা যাবে না, তাই এই দলটি মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে মক্কার পথে অবস্থিত যুল হুলাইফাতে পৌঁছার পর সুযোগ বুঝে আবু বসীর তার সঙ্গীদের মধ্য হতে একজনকে হত্যা করেন, যে সেই দলের নেতা ছিল। আর দ্বিতীয়জনকেও আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করার উপক্রম করেছিলেন, কিন্তু সে কোনোভাবে নিজের প্রাণ রক্ষা করে এমনভাবে দৌড়ে পালায় যে, আবু বসীরের আগেই সে মদীনায় পৌঁছে যায়। (তার) পেছন পেছন আবু বসীরও মদীনায় পৌঁছেন। এ লোকটি যখন মদীনায় পৌঁছে তখন মহানবী (সা.) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তার ভীতত্রস্ত অবস্থা দেখে তিনি (সা.) বলেন, তাকে চরম ভয়ভীতি ও ত্রাসের সম্মুখীন মনে হচ্ছে; আর এর পাশাপাশি সে নিজেও কাঁপতে কাঁপতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, আমার সঙ্গী নিহত হয়েছে আর আমিও মৃত্যুর মুখোমুখি। মহানবী (সা.) তার কাছ থেকে পুরো বৃত্তান্ত শোনেন এবং তাকে আশ্বস্ত করেন। এরই মাঝে আবু বসীরও তরবারি হাতে সেখানে পৌঁছে যান আর আসামাত্রই মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে কুরাইশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আর (এতেই) আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু খোদা তা'লা অত্যাচারী জাতির হাত থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আর এখন আপনার ওপর আমার বিষয়ে কোনো দায়িত্ব নেই। তিনি (সা.) অবলীলায় বলেন,

ويل امه مسعر حرب لوكان له احد

অর্থাৎ তার মায়ের জন্য অমঙ্গল হোক (আরবী বাগধারা)! এই শব্দাবলি আরবী বাগধারায় আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে তিরস্কার বা বিস্ময় কিংবা অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য বলা হয়ে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি তো যুদ্ধের উসকানি দিচ্ছে। হায়! কেউ যদি তাকে বিরত করতো।

আবু বসীর যখন এই শব্দাবলি শোনেন তখন বুঝতে পারেন, মহানবী (সা.) সন্ধির সম্মান রক্ষার্থে তাকে অবশ্যই ফেরত যেতে নির্দেশ দেবেন। অতএব এই বিষয়ে বুখারীর বাক্য হলো,

فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم

অর্থাৎ আবু বসীর যখন মহানবী (সা.)-এর এই শব্দাবলি শোনেন তখন নিশ্চিত হয়ে যান, তিনি (সা.) অবশ্যই তাকে মক্কাবাসীর নিকট ফেরত পাঠাবেন; তাই তিনি চুপিসারে সেখান থেকে বেরিয়ে যান আর মক্কা যাবার পরিবর্তে, যেখানে তিনি দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিলেন, লোহিত সাগরের তীরবর্তী সীফুল বাহরে পৌঁছে যান। যখন মক্কার পরিচয় গোপনকারী এবং অন্যান্য দুর্বল মুসলমানরা এটি জানতে পারে যে, আবু বসীর একটি পৃথক ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছেন তখন তারাও ধীরে ধীরে মক্কা থেকে বের হয়ে সীফুল বাহরে পৌঁছে যায়। তাদেরই মাঝে মক্কার নেতা সুহায়েল বিন আমরের পুত্র আবু জান্দালও ছিল। মহানবী (সা.) তাকে হুদাইবিয়া থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর উল্লেখ গতবার করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি অথবা কতক রেওয়ায়েত অনুসারে তিনশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এভাবে যেন মদীনার বাইরে অপর একটি ইসলামী রাষ্ট্র

আত্মপ্রকাশ করে যা ধর্মের দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর অধীনে ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দিক থেকে পৃথক এবং স্বাধীন ছিল। যেহেতু একদিকে হিজাযের সীমান্তে একটি পৃথক এবং স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার উপস্থিতি কুরাইশের জন্য বিপদের কারণ ছিল আর অপরদিকে সীফুল বাহরের মুহাজিররা মক্কার কুরাইশের হাতে চরম নিপীড়িত ছিল, তাই খুব বেশি দিন অতিবাহিত হবার পূর্বেই সীফুল বাহরে হিজরতকারীদের সাথে মক্কার কুরাইশের সম্পর্ক প্রায় তেমনই রূপ ধারণ করে যেমনটি প্রথমদিকে মদীনায় হিজরতকারীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। যেহেতু সীফুল বাহর মদীনা থেকে সিরিয়া যাবার রাস্তার খুব কাছে ছিল, তাই কুরাইশ কাফেলার সাথে এই মুহাজিরদের সংঘর্ষ হতে থাকে। এই নতুন লড়াই খুব দ্রুত কুরাইশের জন্য ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে, কেননা প্রথমত পূর্ববর্তী যুদ্ধের কারণে কুরাইশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত এখন তারা পূর্বের তুলনায় সংখ্যায়ও অনেক কম ছিল। আর তাদের বিপরীতে সীফুল বাহরের ইসলামী রাষ্ট্র, যা আবু বসীর এবং আবু জান্দালের ন্যায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ছিল, ঈমানের সতেজ উদ্দীপনা ও নিজেদের অতীত অত্যাচারের তিক্ত স্মৃতির কারণে এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তিতে সমৃদ্ধ ছিল যা কোনো মোকাবিলার তোয়াক্কা করে না। পরিণতি যা হয় তা হলো, স্বল্প সময়ের মধ্যেই কুরাইশ হার মেনে নেয় আর আবু বসীরের দলের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে একজন দূতের মাধ্যমে অনুরোধ করে আর নিজেদের আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে নিবেদন করে, সীফুল বাহরে অবস্থিত মুহাজিরদের মদীনায় ডেকে নিয়ে নিজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করে নিন। একই সাথে মহানবী (সা.)-এর নিকট হুদাইবিয়ার সন্ধির এই শর্ত যে, মক্কার নবমুসলিমদের মদীনায় আশ্রয় দেওয়া হবে না– স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেয়। অর্থাৎ মুসলমান হয়ে কারো মদীনায় আসা ও তাকে ফেরত পাঠানোর শর্তও তারা নিজেরাই তুলে নেয় এবং বলে, ঠিক আছে, আপনি নিঃসন্দেহে (তাদের) আশ্রয় দিন।

মহানবী (সা.) এ আবেদন গ্রহণ করেন এবং আবু বসীর ও আবু জান্দালকে একটি পত্রের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করেন, কুরাইশ যেহেতু স্বেচ্ছায় চুক্তিতে পরিবর্তন এনেছে তাই তাদের এখন মদীনায় চলে আসা উচিত। অর্থাৎ তোমরা এখানে মদীনায় চলে আসো। মহানবী (সা.)-এর দূত যখন সীফুল বাহর পৌঁছে তখন আবু বসীর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন ও অবস্থার অবনতি ঘটছিল। আবু বসীর মহানবী (সা.)-এর বরকতমণ্ডিত পত্রটি পরম যত্নে নিজ হাতে ধরে রাখেন এবং কিছুক্ষণ পর সে অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেন। অর্থাৎ তার মৃত্যু হয় এবং এরপর আবু জান্দাল ও তার সঙ্গীরা তাদের এই অকুতোভয় ও সাহসী নেতাকে সীফুল বাহরেই সমাহিত করে আনন্দ ও দুঃখের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে পৌঁছে যান। দুঃখ এজন্য যে, তাদের সাহসী নেতা আবু বসীর, যিনি এ ঘটনার নায়ক ছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলেন। আর আনন্দিত এজন্য ছিলেন যে, তারা নিজেরা স্বীয় প্রেমাস্পদের সকাশে পৌঁছে গিয়েছেন আর কুরাইশের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

অমুসলিম ইতিহাসবিদরা স্বভাবতই ইতিহাস বিকৃত করে ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কেও খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের আপত্তিসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন,

সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর জীবনীর এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই যেটি সম্পর্কে খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদরা আপত্তি উত্থাপন করে নি। আর হুদাইবিয়ার সন্ধি একই শ্রেণিভুক্ত।

কতিপয় প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বহীন আপত্তিসমূহকে উপেক্ষা করে খ্রিষ্টান লেখকরা হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে দুটি আপত্তি উত্থাপন করেছে।

প্রথমত, মহানবী (সা.) যে হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলি থেকে মহিলাদের বাইরে রেখেছেন– এটি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বৈধ ছিল না; কেননা চুক্তির শব্দাবলি সাধারণ ছিল যাতে নরনারী সবাই অর্ন্তভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় আপত্তি হলো, আবু বসীরের ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়ে মহানবী (সা.) চুক্তির মূল উদ্দেশ্যকে পদদলিত করেছেন। বরং আবু বসীরকে এ ইঙ্গিত প্রদান করে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন যে, তিনি মক্কায় ফেরত যাবার পরিবর্তে একটি পৃথক দল গঠন করে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

অতএব এসব আপত্তির উত্তরে সর্বপ্রথম এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত, এ চুক্তি মক্কার কুরাইশের সাথে হয়েছিল। কুরাইশ সেই জাতি ছিল যারা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। যখন চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছিল সেসময়ও আমরা দেখি, তাদের প্রতিনিধিরা ছোটো ছোটো বিষয়ে তাঁর (সা.) সামনে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করছিল। এ জাতি কথায় কথায় আপত্তি উত্থাপন ও খোঁটা দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল। এমনিতেও তারা দূর-দূরান্তের কোনো ভিনজাতি ছিল না, বরং মহানবী (সা.)-এর স্বজাতি ছিল যারা সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত ছিল। কুরাইশ জাতি, যাদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তারা তো নিজেদেরই লোক ছিল, মহানবী (সা.)-এর স্বজাতি ছিল। সকল বিষয়ে তারা অবহিতও ছিল আর তারা সকল খুঁটিনাটি সামনে রেখেই চুক্তিও সম্পাদন করেছিল। তাই একথা বলা ভুল, নারী-পুরুষ উভয়ে অর্ন্তভুক্ত ছিল। কুরাইশ জানতো অন্তর্ভুক্ত ছিল নাকি ছিল না।

যাহোক, এরপর তিনি লেখেন, এছাড়া চুক্তির শর্তসমূহের সমস্ত খুঁটিনাটি এবং সেগুলোর পুরো প্রেক্ষাপটও তাদের চোখের সামনে ছিল। সুতরাং যেক্ষেত্রে মক্কার কুরাইশ, যারা চুক্তির একপক্ষ ছিল, মহানবী (সা.)-এর এই কাজে আপত্তি করে নি এবং এটিকে চুক্তিলঙ্ঘন মনে করে নি, সেখানে তেরোশ বছর পর লোকদের আপত্তির অধিকার কীভাবে থাকতে পারে– চুক্তির অনেক খুঁটিনাটি বিষয় যাদের দৃষ্টির আড়ালে, আর চুক্তির প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও যারা পুরোপুরি অবগত নয়? সেসব মুশরিক তো আপত্তি করে নি! অধুনা কালের প্রাচ্যবিদরা আপত্তি করে; (যারা ইসলামের ওপর আপত্তি করে)। এটি তো বাদী নীরব সাক্ষী সরব হবার মতো হাস্যকর বিষয়। যাদের সাথে এ সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তারা সেটিকে সঠিক আখ্যা দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছে, কিন্তু তেরোশ বছর পরের লোকেরা তুলকালাম কাণ্ড ঘটাচ্ছে। অথচ কুরআন, হাদীস এবং আরবের ইতিহাস সেসব আপত্তিতে পরিপূর্ণ যেগুলো মক্কার কাফিররা এবং আরবের অন্যান্য কাফিররা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আরোপ করতো। কিন্তু মুসলমানরা হুদাইবিয়ার সন্ধি লঙ্ঘন করেছে মর্মে আপত্তির উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। এর কারণ কী? এক সুদীর্ঘকাল যাবৎ কোনো আপত্তি হয় নি। এ যুগে তারা জানতে পারছে যে, আপত্তি করতে হবে।

এছাড়াও এ বিষয়টি অত্যন্ত শক্তিশালী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত। যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.) রোমান সম্রাটকে তবলীগ করে পত্র লেখেন এবং সেসময় কাকতালীয়ভাবে মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবও সিরিয়া গিয়েছিল, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে। সেসব প্রশ্নের মাঝে একটি প্রশ্ন ছিল, তোমার জাতির এই নবুওয়্যতের দাবিদার কি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফিয়ান– যে সেই সময় অস্বীকারকারীদের নেতা ছিল এবং

ইসলামের কঠোরতম শত্রু ছিল– সে যা বলেছিল তা ছিল, 'না, মুহাম্মদ (সা.) কখনো কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নি। তবে বর্তমানে আমাদের ও তার মাঝে একটি চুক্তির মেয়াদকাল অতিবাহিত হচ্ছে। আমি জানি না, এই অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কী আচরণ প্রকাশিত হয়।' আবু সুফিয়ান বলে, এই পুরো বাক্যালাপে আমার জন্য এই বাক্যটি যোগ করা ছাড়া মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে হিরাক্লিয়াসের হৃদয়ে কোনো সম্ভাব্য সন্দেহের বীজ বপন করার আর কোনো সুযোগ ছিল না।

আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াসের এই আলোচনা হুদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে সংঘটিত হয় নি। বরং মহানবী (সা.) হিরাক্লিয়াসের নামে পত্র প্রস্তুত করে প্রেরণ এবং সেই পত্র হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছানো এবং হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে দরবার অনুষ্ঠিত হওয়া এবং আবু সুফিয়ানকে খুঁজে নিজের দরবারে ডেকে পাঠাতে অবশ্যই সময় লেগে থাকবে। কেননা সে যুগে সফর সহজ ছিল না। অনুমান করা যেতে পারে সে সময় পর্যন্ত আবু বসীরের মদীনাতে পালিয়ে আসা এবং উম্মে কুলসুম ও অন্যান্য মুসলমান নারীদের মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনাতে পৌঁছে যাবার ঘটনাবলি সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকবে। সেজন্য সকল ইতিহাসবিদ আবু বসীর ও উম্মে কুলসুমের ঘটনাকে প্রথমে এবং রোমান সম্রাটের পত্রের ঘটনাকে পরের ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান হিরাক্লিয়াসের দরবারে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে নি। অথচ তার শব্দাবলি বলে দিচ্ছে, তার ইচ্ছা ছিল– যদি কোনো সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে দ্বিধা করব না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তেরোশ বছর পর জন্মগ্রহণকারী সমালোচকরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গের অপবাদ আরোপ করতে গিয়ে খোদাকে ভয় করে না। পরিতাপ, বড়োই পরিতাপ!

অতঃপর আমরা যদি এই আপত্তিসমূহকে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে সেগুলোর অসারতা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম আপত্তিটি হলো প্রকৃতপক্ষে পুরুষ এবং নারী উভয়েই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) বলপূর্বক নারীদেরকে চুক্তির বাইরে রেখেছেন। কিন্তু যেভাবে এখানে আমি পূর্বে বলেছি, এ আপত্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কেননা সন্ধিচুক্তির সেই বাক্য যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝায়, সন্ধিচুক্তিতে কেবল পুরুষদের কথা বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ উভয়ের নয়। তাই যেভাবে পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি, সহীহ্ বুখারীতে সন্ধিচুক্তির সংরক্ষিত বাক্য হলো,

لا یاتیک منا رجل و ان کان علی دینک الا رددتہ الینا۔

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে পুরুষই আপনার কাছে যাবে, সে মুসলিম হলেও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই স্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও এই আপত্তি করা যে, বাস্তবে চুক্তিতে নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝানো হয়েছে, তা শুধু অন্যায়ই নয়, বরং চরম অসৎ পন্থা। আর যদি বলা হয়, ইতিহাসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে চুক্তির বাক্যে 'রাজুল' অর্থাৎ 'পুরুষ' শব্দটি উল্লেখ করা হয় নি, বরং সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে নারী ও পুরুষ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে; সেক্ষেত্রে প্রথম উত্তর হলো, শক্তিশালী রেওয়ায়েতটিকে অগ্রগণ্য করা হবে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে 'রাজুল' অর্থাৎ 'পুরুষ' শব্দটি এসেছে, তাই সেটিকেই সঠিক শব্দ হিসেবে মানা আবশ্যক হবে। এছাড়াও যে বাক্য ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিদ্যমান তা নিয়ে যদি প্রণিধান করা হয়

তাহলে স্পষ্ট হবে, সেগুলোও এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সুপরিচিত গ্রন্থ সীরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে,

من اتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم

অর্থাৎ কুরাইশের যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাবে তাকে কুরাইশের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে।

আরবী ভাষার এ বাক্যে পুরুষ শব্দটি স্পষ্টভাবে বলা হয় নি, কিন্তু আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও জানেন, অন্যান্য কিছু ভাষার বিপরীতে আরবী ভাষায় নারী ও পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াপদ (সীগা) এবং ভিন্ন ভিন্ন সর্বনাম (যামায়ের) ব্যবহৃত হয়। উপরের বাক্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ এবং পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সন্ধিচুক্তির ভাষার ব্যাখ্যার নিয়মানুযায়ী এ বাক্যটিতে শুধু পুরুষই বোঝানো হয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে, নারী-পুরুষ উভয়কে নয়। নিঃসন্দেহে কখনো কখনো সাধারণ বাগধারায় পুংলিঙ্গবাচক সর্বনাম ব্যবহার করে নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, আলোচ্য বাক্যটি ঐ ধরনের বাক্য নয়, বরং চুক্তির বাক্য যেটি আইনের মর্যাদা রাখে, বরং তার চাইতেও অধিক; কেননা এর এক একটি শব্দ গভীর চিন্তাভাবনা করে নির্ধারণ করা হয় এবং উভয়পক্ষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের পরে শব্দচয়ন করা হয়; তাই নিশ্চিতভাবে এই জাতীয় বাক্যের অর্থ সেটিই করতে হবে যা সবচেয়ে সীমিত ও সুনির্দিষ্ট। জেরার বিস্তারিত বর্ণনা আপনারা বিগত খুতবায় শুনেছেন, কাফিরদের প্রতিনিধি কতো বিস্তারিতভাবে জেরা করেছিল। সুতরাং এদিক থেকেও বস্তুত এটিই সাব্যস্ত হয় যে, এ চুক্তিতে শুধুমাত্র পুরুষগণ অন্তর্ভুক্ত, নারী-পুরুষ উভয়ে নয়। এছাড়া যেভাবে ওপরে বলে এসেছি, নারী– যারা দুর্বল শ্রেণী হয়ে থাকে এবং সাধারণত নিজেদের স্বামী ও পুরুষ আত্মীয়স্বজনের দয়ামায়ার ওপর নির্ভর করে– তাদের ফিরিয়ে দেবার অর্থ এটাই দাঁড়াতো, ইসলাম গ্রহণের পর তাদের নিজ হাতেই কুফর ও শিরকের দিকে ঠেলে দেওয়া, যা কেবল অনুগ্রহ ও দয়া বিবর্জিতই নয়, বরং ইনসাফ ও ন্যায় থেকেও দূরে।

নিঃসন্দেহে একজন পুরুষকে ফিরিয়ে দেবার মাঝেও তার জন্য এ ঝুঁকি বিদ্যমান যে, মক্কার কাফিররা তাকে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও কষ্টে নিপতিত করবে; কিন্তু পুরুষ তো পুরুষই। সে শুধু অত্যাচারের মোকাবিলাই করতে পারে না, বরং প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে আত্মগোপন করে বা পালিয়ে আত্মরক্ষার রাস্তা বের করে নিতে পারে, যেমনটি আবু বসীর করেছিলেন। পক্ষান্তরে একজন অসহায় মহিলা কী-ইবা করতে পারে? এরূপ ক্ষেত্রে হয় তাকে জোরপূর্বক ইসলাম থেকে বঞ্চিত করা হবে অথবা তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এমতাবস্থায় একজন অসহায় ও দুর্বল মুসলমান নারীকে নির্যাতনের জন্য অত্যাচারী কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো মহানবী (সা.)-এর মতো দয়ালু ও কৃপাময় সত্তার জন্য অসম্ভব ছিল। সুতরাং যা কিছুই করা হয়েছিল তা শুধু চুক্তির দিক থেকেই সঠিক ও যথার্থ ছিল না, বরং ন্যায়বিচার ও ইনসাফ আর দয়ামায়ার স্বীকৃত নীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও একান্ত উপযুক্ত ও সঠিক ছিল। চরম লজ্জাকর পরিণতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আপত্তিকারীদের আর কিছুই হস্তগত হয় নি, অর্থাৎ তারা নির্যাতিত ও অসহায় মহিলাদের সুরক্ষামূলক পদক্ষেপের বিষয়েও ঠাট্টাবিদ্রুপ করতে দ্বিধা করে নি।

দ্বিতীয় আপত্তি আবু বসীরের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। অথচ গভীর অভিনিবেশ করলে এই আপত্তিও একদম অযথা ও দুর্বল প্রমাণিত হয়। নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.) এই চুক্তি

করেছিলেন যে, মক্কা থেকে যে ব্যক্তি পালিয়ে মদীনায় আসবে– সে মুসলমানই হোক না কেন– তাকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়া হবে না আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মহানবী (সা.) কি এই চুক্তি ভঙ্গ করেছেন? কখনোই নয়, কখনোই নয়। বরং তিনি (সা.) এই চুক্তি মেনে চলার এমন সম্পূর্ণ ও মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, সারা বিশ্ব এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে অপারগ। ভাবুন ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন যে, আবু বসীর ইসলামের সত্যতায় মুগ্ধ হয়ে মক্কা থেকে পলায়ন করেন; কাফিরদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে ও নিজের ঈমানের সুরক্ষার জন্য লুকিয়ে মদীনায় পৌঁছান, কিন্তু তার অত্যাচারী স্বজনরাও তার পেছনে পেছনে মদীনায় আসে এবং তরবারির জোরে তাকে ইসলামের সত্যতা থেকে বিরত রাখার জন্য জোরপূর্বক ফিরিয়ে নিতে চায়। তখন উভয় পক্ষ মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়। বসীর আবেগঘন অথচ ভীত কণ্ঠে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে খোদা তা'লা ইসলামের নিয়ামতে ধন্য করেছেন, আর মক্কায় ফিরে যাবার মাঝে যে কষ্ট ও ভীতিপ্রদ জীবন আমার সামনে রয়েছে– তা আপনি জানেন। খোদার দোহাই, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না! অথচ এর বিপরীতে আবু বসীরের স্বজনরা মহানবী (সা.)-এর কাছে দাবি করে, আপনার এবং আমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে, আমাদের যে ব্যক্তি মদীনায় আসবে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আবু বসীরের কষ্ট এবং সাহাবীদের আত্মভিমান তাঁর (সা.) চোখের সামনে আর তাঁর নিজের অনুভূতি তাঁর নিজ হৃদয়ে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ন্যায় বিরাজ করছিল, কিন্তু আমানত ও সততার মূর্ত প্রতীক মহানবী (সা.) নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় পর্বতের ন্যায় অনড় থেকে পরম আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বলেন, 'হে আবু বসীর! তুমি জানো, আমরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং আমাদের ধর্মে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৈধ নয়।' দেখুন! এক ব্যক্তির জীবনের প্রশ্ন, তবুও তিনি (সা.) বলেন, আমাদের ধর্মে অঙ্গীকার ভঙ্গ বৈধ নয়। (অথচ) আমরা তুচ্ছ কারণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসি। তাই আমাদের নিজ নিজ ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, সুতরাং তুমি তাদের সাথে ফিরে যাও। যদি তুমি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে খোদা তোমার জন্য, তোমার মতো অন্যান্য অসহায় মুসলমানদের জন্য নিজেই কোনো পরিত্রাণের রাস্তা খুলে দেবেন। আমরা দেখেছি যে, পরিত্রাণের পথ খুলে গেছে।

মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনায় আবু বসীর মক্কাবাসীদের সাথে ফিরে যান। আর যখন তিনি মক্কা যাবার পথে বন্দিকারীদের সাথে লড়াইয়ে জয়যুক্ত হয়ে পুনরায় ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) তাকে দেখেই রাগান্বিত হয়ে বলেন,

وَيْلُ اُمِّهِ مُسْعِرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدٌ

অর্থাৎ তার মায়ের সর্বনাশ হোক (আরবী প্রবচন)! এই ব্যক্তি তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করছে। হায়, কেউ যদি তাকে বোঝাতো!

এই বাক্য শুনতেই আবু বসীর নিশ্চিত হয়ে যান, মহানবী (সা.) যেভাবেই হোক তাকে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি নিজেই সংগোপনে মদীনা থেকে বের হয়ে গেলেন এবং দূরবর্তী একটি স্থানে নিজের আবাস বানিয়ে নিলেন। এখন এই পুরো ঘটনা যদি ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে এখানে রসূলে করীম (সা.)-এর ওপর কী দায় আরোপিত হয়? আর তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে কী আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে? সত্য কথা হলো, তিনি (সা.) এই ঘটনায় নিজের আবেগকে পদদলিত করে চুক্তি রক্ষা করেছেন। আর আবু বসীরকে শুধুমাত্র একবার নয় বরং

দুইবার ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তাকে এমন চমৎকার নসীহত করে ফেরত পাঠিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া ভার। তিনি (সা.) নিজ আবেগকে পদদলিত করেছেন, নিজ সাহাবীদের আবেগকে পদদলিত করেছেন এবং আবু বসীরের আবেগকেও পদদলিত করেছেন, আর সর্বাবস্থায় সন্ধিচুক্তি রক্ষা করেছেন। এরপর আবু বসীর নিজে যদি মক্কাবাসীদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কোনো স্থানে চলে যান তাহলে এর কারণে মহানবী (সা.)-এর ওপর কী আপত্তি বর্তাতে পারে? আর চুক্তির এমন কোন শর্ত ছিল, যার অধীনে মহানবী (সা.) মক্কা থেকে পলায়নকারীরা যেখানেই থাকুক– সেখান থেকে ধরে এনে তাদের মক্কায় পৌঁছে দিতে বাধ্য থাকবেন? হায়, পরিতাপ! ইসলামের শত্রুরা কোনো বিষয়েই ইসলামের সাথে ন্যায়বিচার করে নি।

আর যদি এই আপত্তি করা হয়, রসূলে করীম (সা.) আবু বসীরকে তার তৈরি করা ক্যাম্প থেকে মদীনায় চলে আসার নির্দেশ পাঠাতে পারতেন; আর যেহেতু তিনি এমনটি করেন নি তাই তিনি (সা.) বাহ্যত চুক্তির শব্দাবলি ভঙ্গ না করলেও চুক্তির উদ্দেশ্যকে পদদলিত করেছেন। এই বাজে আপত্তিটিও করা হয়ে থাকে।

এটিও একটি নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত আপত্তি আর স্বয়ং চুক্তিতে উল্লিখিত বাক্যসমূহ এবং এই বাক্যের মূল প্রতিপাদ্য এটিকে প্রত্যাখ্যান করে। চুক্তির এই শর্তটি– যদি মক্কায় বসবাসকারী কোনো মুসলমান পালিয়ে মদীনায় চলে আসে তাহলে মহানবী (সা.) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন– পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, এই চুক্তির উদ্দেশ্য এটি ছিল, এমন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাকে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখার ভেতর অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অর্থাৎ যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে মুসলমান, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে নিজ মদীনা রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করবেন না। সুতরাং এমন ব্যক্তি যে নিজেই চুক্তির এই শর্ত অনুযায়ী মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত বলে আখ্যায়িত হয়েছে, তার ক্ষেত্রে এই দাবি কীভাবে উত্থিত হতে পারে যে, সে যেখানেই থাকুক রসূলে করীম (সা.) তাকে নির্দেশ দিয়ে ফেরত যেতে বলবেন? সুতরাং এটি কত বড়ো নিষ্ঠুরতা যে, রসূলে করীম (সা.) যদি এমন ব্যক্তিকে মদীনায় আশ্রয় দেন তাহলে তাঁর ওপর এই আপত্তি করা হয়, তিনি (সা.) চুক্তি করেছিলেন– কোনো ব্যক্তি মুসলমান হলেও তাকে তাঁর রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আর তিনি (সা.) যদি তাকে নিজের মদীনা রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করে মক্কাবাসীদের হাতে সোপর্দ করেন তাহলে এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তিনি (সা.) কেন তাকে নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে (তাঁর কাছে আসার) নির্দেশ প্রদান করেন না?

অতএব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এরূপ বাজে, দুর্বল ও অর্থহীন আপত্তি যে, এর প্রতি কোনো সুস্থ-বিবেকবান ব্যক্তির মন সায় দিতে পারে না। আর প্রকৃত বিষয় হলো, এই অযৌক্তিক শর্ত যা কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, অর্থাৎ কোনো মুসলমান হিজরতকারীকে যেন মদীনায় আশ্রয় দেওয়া না হয়– এটিকেই খোদা তা'লা তাদের জন্য আযাবে পরিণত করে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, আমাদের রসূল তো সর্বাবস্থায় সন্ধি রক্ষা করেছে কিন্তু তোমরা স্বয়ং নিজেদের পথে কাঁটা বিছিয়েছ এবং নিজেদের অস্ত্র দ্বারাই নিজেদের হাত কর্তন করেছ। তোমরা যখন নিজেরাই বলেছ, মক্কার যে যুবকই মুসলমান হয়ে মদীনায় যাবে, তাকে মহানবী (সা.) মদীনায় রাখতে পারবেন না আর তাকে মদীনা রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত জ্ঞান করা হবে; তাহলে একই মুখে তোমরা কীভাবে এই দাবি করতে পার যে, মদীনা রাষ্ট্র হতে বহিষ্কৃত এ সকল লোকেরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করে এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে মক্কায় পৌঁছে দেবেন? এটি

অজ্ঞতাপ্রসূত কথা। তোমরা স্বয়ং এই শর্ত উপস্থাপন করেছ যে, মহানবী (সা.) নিঃসন্দেহে এমন সব লোকদের হৃদয়ে ও পারত্রিক বিষয়ে রাজত্ব করতে পারবেন, কিন্তু তাদের রাষ্ট্রীয় ও জাগতিক বিষয়ে কর্তৃত্ব করতে পারবেন না; রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং আইনগত দিক দিয়ে তাদের ওপর তাঁর (সা.) কোনো অধিকার থাকবে না; নিঃসন্দেহে তারা আধ্যাত্মিকভাবে মুসলমান, তারা মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছে, মুসলমান হয়েছে তাই মুমিন বলে আখ্যায়িত হবেন। কিন্তু তারা নিজেরাই শর্ত দিয়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে (তারা) তোমার অধীন হবে না, যা তিনি (সা.) মেনেও নিয়েছিলেন। আর যেক্ষেত্রে তোমরা স্বয়ং তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর রাজত্ব থেকে বের করে দিয়েছ, সেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আপত্তি কীভাবে হতে পারে?

যাহোক, এটি মক্কার কুরাইশের নিজস্ব ষড়যন্ত্র ছিল, যা তাদেরই ওপর আপতিত হয়েছে। আর মহানবী (সা.)-এর সত্তা সর্বাবস্থায় পবিত্র ছিল এবং পবিত্র থাকবে। তিনি (সা.) সন্ধির শব্দাবলিও পূর্ণ করেছেন এবং আবু বসীরকে মক্কাবাসীদের নিকট সোপর্দ করে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। তিনি (সা.) সন্ধির শর্তও পূর্ণ করেছেন; অর্থাৎ যেভাবে এই শর্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তদনুযায়ী তিনি (সা.) আবু বসীর ও তার সঙ্গীদেরকে তাঁর রাষ্ট্রীয় সীমানা হতে বাইরে রেখেছেন। অতএব তিনি (সা.) সকল অর্থে সত্য সাব্যস্ত হয়েছেন এবং মক্কার কাফিররা নিজেদের বিস্তৃত জালে নিজেরাই ধরাশায়ী হয়েছে। আর পরিশেষে তারাই লাঞ্ছিত হয়ে তাঁর (সা.) কাছে আসে এবং বলে, আমরা এই শর্তকে সন্ধির শর্তাবলি হতে বাদ দিচ্ছি।

আর একথা বলা যে, মহানবী (সা.) وَيْلُ اُمِّهٖ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهٗ اَحَدٌ অর্থাৎ তার মায়ের জন্য দুর্ভোগ! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করছে। হায়! কেউ যদি একে থামাতো– শব্দাবলির মাধ্যমে আবু বসীরকে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন; [এই আপত্তিও করে যে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমরা পৃথক দল বানিয়ে কুরাইশের সাথে যুদ্ধ শুরু করো;] এটি কত বড়ো অন্যায় এবং কত নোংরা মানসিকতা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে কীরূপ অজ্ঞতা! এই শব্দাবলি তো মহানবী (সা.)-এর সত্যতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি (সা.) এই ইঙ্গিত করেন নি যে, 'তুমি যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করো'; বরং বলেছেন, এ কি যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করতে চায়? আর একথা এই বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, তিনি (সা.) আবু বসীরের এরূপ কাজের সাথে সম্পর্কহীনতা, দায়মুক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন; এটি নয় যে, তাকে কোনো গোপন ইঙ্গিত প্রদান করে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করতে চাচ্ছেন।

আর স্যার উইলিয়াম মুইরের ন্যায় যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, মহানবী (সা.)-এর শেষ বাক্য لَوْ كَانَ لَهٗ اَحَدٌ – এর এই অর্থও হতে পারে, যদি সে কাউকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যায়; এতে প্রতীয়মান হয়, তাঁর (সা.) কথার অর্থ হলো, যদি আবু বসীর কোনো সঙ্গী পেয়ে যায় তবে সে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারে। আর এভাবে তাঁর কথায় যেন যুদ্ধে প্ররোচিত করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অতএব এই আপত্তির জবাব হলো, প্রথমত যে অর্থ করা হয়েছে সেটি হুবহু আরবী বাগধারা অনুযায়ী করা হয়েছে, যেটি আমরা ইতিহাসেও উল্লেখ করেছি আর যার উদাহরণ হাদীসেও অনেক স্থানে দেখা যায়। এছাড়া ধরুন উইলিয়াম মুইর সাহেব যে অর্থ করতে চান সে অর্থও যদি করা হয়, তাহলেও প্রসঙ্গের নিরিখে এই বাক্যের এ ছাড়া ভিন্ন কোনো অর্থ

করা যায় না; অর্থাৎ আবু বসীর যদি সমমনা কোনো সঙ্গী পেয়ে যায় তাহলে সে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারবে! কিন্তু সৌভাগ্যবশত মদীনায় সে এমন কোনো সঙ্গী খুঁজে পায় নি। [অর্থাৎ যদি সঙ্গী পায় তাহলে করতে পারবে, কিন্তু আমাদের কাছে তো এমন কোনো সঙ্গী নেই যে তাকে সাহায্য করতে পারে।]

অতএব যে অর্থই করা হোক না কেন, এই বাক্যের পূর্বাপর এবং এর প্রথম অংশ এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে, মহানবী (সা.)-এর অভিপ্রায় ছিল আবু বসীরকে তিরস্কার করা, তাকে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করা নয়। তাঁর কথার অসন্তোষ ও তিরস্কারবোধক শব্দ "অমুক ব্যক্তির মায়ের জন্য দুর্ভোগ! সে তো যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী"– দ্বারা যে ব্যক্তি আরম্ভ করে, তিনি কি এর অনতিপরেই এ ধরনের বাক্য মুখে আনতে পারেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, যুদ্ধ লাগাও"? সর্বোপরি, আপত্তি করার নেশায় বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া তো উচিত নয়। কিন্তু তথাকথিত প্রাচ্যবিদ, যারা শিক্ষিত হবার দাবি করে, কিন্তু যখন মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন আসে, ইসলামের ইতিহাসের প্রশ্ন আসে, তখন তারা একেবারেই বিবেক বিবর্জিত কথা বলা শুরু করে।

এরপর সবচেয়ে বড়ো দেখার বিষয় হলো, স্বয়ং আবু বসীরের ওপর মহানবী (সা.)-এর এই বাক্যাবলির কী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তিনি নিজে তাঁর কথার কী অর্থ বুঝেছেন। অতএব এ বিষয়ে এই রেওয়ায়েতেই এ বাক্য রয়েছে, فلما سمع ذٰلک عرف انه سيردہ اليهم অর্থাৎ আবু বসীর মহানবী (সা.)-এর এই বাক্য যখন শুনলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে তিনি (সা.) যে–কোনো উপায়ে মক্কাবাসীদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। ফলে তিনি চুপিসারে পলায়ন করে অন্যত্র চলে গেলেন।

পরিতাপ, শত পরিতাপ! যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এ বাক্যগুলো বলা হলো তিনি স্বয়ং এর এই অর্থ বুঝলেন যে, মহানবী (সা.) তার এই কাজ অপছন্দ করেছেন আর তাকে তিনি (সা.) যে–কোনো মূল্যে মক্কাবাসীদের কাছে ফেরত পাঠাবেন; কিন্তু আমাদের তেরোশ বছর পর আগত বন্ধুরা একথা বলছেন যে, তিনি (সা.) মূলত আবু বসীরকে পৃথক দল বানিয়ে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। ধিক্কার এমন অন্ধ বিদ্বেষের প্রতি! অন্যায়ের একটা সীমা থাকা উচিত।

তথাকথিত ন্যায়ের ধ্বজাধারীরা বরাবরই এরূপ দ্বৈত নীতি অবলম্বন করে আসছে, যা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছে আর আজও সেই বিপর্যয় চলমান। আল্লাহ্ তা'লা আজও বিশ্বকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন আর এই দাজ্জালী ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)